'বাঁয়েন', 'তালাক', 'দ্রৌপদী', 'শনিচরী', 'স্তনদায়িনী', 'হুলমাহার মা', 'চোলিকা পিছে', 'সংরক্ষন', 'শেষ শামানিন', 'এম. ডব্লু. বনাম লখিন্দ', 'আত্মজা', 'জল', 'অস্থি', 'চম্পা', 'রোমথা', 'চিন্তা', 'সতী রানির ঘাট', 'পদ্মিনী', 'যশবন্তী', 'অপারেশন বসাই টুডু', 'ধৌলি', 'রুদালী', 'সাঁজ সকালের মা', 'যশোমতী', 'যমুনাবতীর মা', 'চরণদাসী', 'গিরিবালা', 'মায়ের মূর্তি',প্রভৃতি গল্প গুলি পড়তে পড়তে মহাশ্বেতার যে গল্পবিশ্বের সঙ্গে আমরা পরিচয় হই তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা অসামান্য। লেখিকার উল্লেখযোগ্য আখ্যান বিশ্বও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারিত। ইতিহাসের নিত্যনতুন ব্যবহার,লুকিয়ে থাকা সুপ্ত অন্তর্বয়নকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে উজ্জীবিত করে তুলে। পাশাপাশি ছোটগল্পের সূক্ষ্ম মাধ্যমেও নিজের শৈল্পিক কর্মকুশলতাকে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেন সত্য - অসত্যের বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যদিয়ে। উচ্চশ্রেণির ও নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে যে গভীর ও ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে মহাশ্বেতার লিখন-সাম্রাজ্য পড়তে পড়তে তা পরিপূর্ণভাবে ধরা পরেছে। সচেতন পাঠকবর্গ যদি বিনির্মান বাদের নিরিখে এবং বহুস্বরিক দৃষ্টিতে মহাশ্বেতার গল্পবিশ্বকে অধ্যয়ন করে তাহলে তা সহজেই ধরা পড়ে। ফলে মহাশ্বেতার গল্পেস্বর-স্বরান্তরের মাত্রাগতব্যঞ্জনা তাঁর গল্পের বিষয়গত গুরুত্বকে অন্যভাবে অর্থাৎ প্রচলিত ফর্মের বাইরে গিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে।এবারে আমরা মহাশ্বেতার ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে ঢোকার আগে সংক্ষেপে বুঝে নেব স্বর ও স্বরান্তরের মাত্রাটিকে।

স্বর হচ্ছে আখ্যানের মাধ্যমে বক্তাকে চেনা অর্থাৎ বক্তার নিজস্ব স্বর যা আখ্যানে ব্যক্ত হয়ে থাকে। প্লেটোর মতে দু ধরণের স্বর আখ্যানে ব্যবহৃত হয়। একটা হচ্ছে আখ্যানে বর্ণিত চরিত্রের স্বর (Voice of characters) অর্থাৎ সংলাপের মাধ্যমে যা উঠে আসে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে লেখক বা বক্তার স্বর (Voice of narrator or author)। বাখতিন বলেছেন যে, 'যখন আখ্যানে এই লেখক স্বর এবং চরিত্রের অনুগামি স্বরের মধ্যে পার্থক্যের বোধ সৃষ্টি হয়, তখনও অনেকার্থদ্যোতনায় সঞ্চার ঘটে উপন্যাসে।' এবং এটাকেই ' Double – voiced discourse বলেছেন তিনি। এভাবে দুটো স্বরের মধ্যে নিরন্তর বিনিময় বা দ্বিরালাপ চলতে থাকে। একদিকে চরিত্রের স্বর স্বাভাবিক ভাবেই লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী গঠিত হয় এবং অন্যদিকে লেখক স্বর খুব নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত

থাকে সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে, আর এই পরস্পর টানা পোড়েনেই অনেকার্থদ্যোতনার সঞ্চার করে। কিন্তু এত গেল স্বরের কথা। যা অবশ্যই ব্যক্ত থাকে এবং একজন পাঠক তা পাঠ করে বুঝতে পারেন। যেহেতু স্বরের উপস্থাপনায় তার রূপায়ন ঘটে।

কিন্তু কখনো কখনো একটা কিছু পাঠ করার পর পাঠকের মনে হতেই পারে যে ব্যক্ত স্বরের মাধ্যমে লেখক যা বলতে চেয়েছেন তার নির্ধারিত সীমানার বাইরেও এমন কিছু ভাবের ইঙ্গিত রয়েছে, যা হয়তো লেখকের দ্বারা রূপায়িত হয়নি কিন্তু পাঠক সেই অব্যক্ত ভাবের বিস্তার ঘটাতে পারেন। সেটা কবিতার ক্ষেত্রে কোন শব্দের পুনরাবৃত্তিতেও হতে পারে আবার গদ্যের ভাব ব্যঞ্জনাতেও হতে পারে। এই অকথিত বা অব্যক্ত নৈ:শব্দের অঞ্চল বা বলতে পারি অপ্রকাশিত অঞ্চলকেই আমরা অন্ত:স্বর বলছি। যা লেখক নির্মিত আখ্যানকে জড়িয়ে থাকে অথচ এমন ভাবে লুকায়িত থাকে যে সক্রিয় পর্যবেক্ষক পাঠকের নিবিড় অবলোকন ছাড়া তা সহজে চোখে পড়েনা। মজার বিষয় হল যে আখ্যানের কাঠামোটি আমাদের কাছে প্রকাশিত, আমরা পাঠ করছি; সেই একই কাঠামো থেকেই কিন্তু অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত ভাবের ব্যঞ্জনাও উঠে আসছে। কিন্তু তা কোনোভাবেই লিখিত ফর্মে থাকে না। দৃষ্টান্ত সহকারে এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য মহাশ্বেতা দেবীর কয়েকটি ছোটগল্পের আলোচনা করা যেতে পারে।

'স্তনদায়িনী' গল্পটি যদি পাঠ করা যায় তা হলে যে অংশ টুকু দৃশ্য হয় তা হল যশোদার দুধমা হিসেবে জীবিকা অর্জনের বিষয়টি। নিজের স্তনের দুধ দান করে যশোদা সংসারচালায়। স্বামী এবং বড় বাবু উভয়েরই মনোরঞ্জন করে। এবং একটা সময় তার প্রয়োজন ফুরালে সকলেই তাকে ত্যাগ করে ও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। কিন্তু গল্পটির নিবিড় পাঠ আমাদের কাছে দাবি করে অন্তর্নিহিত কিছু সত্য উদ্ঘাটনের। যশোদা তার ঘরে যেমন শোষিত স্বামীর দ্বারা আবার বাইরেও হালদার বাড়ির দ্বারা। এই পণ্যায়িত সমাজ তার নাঁড়িছেঁড়া সম্পর্কটিকে পণ্যের পসরা করে তুলেছে। বাড়িতে পঙ্গু স্বামীর প্ররোচনা তাকে অন্যের দুধমা হতে বাধ্য করে। তাঁর সঙ্গে বারতি পাওনা প্রতি রাতে তার

কামনা মেটানোর উদ্যত চাহিদা। যুক্তি দেখায় পেটে সন্তান আসলে তবেই তো দুধের যোগান দেবে সে। এভাবেই শোষিত হয় নারী এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব সম্পর্কের মর্যাদাও। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন যশোদা রোগের শিকার হল; তার শ্রম উৎপাদন থেকে বিচ্যুত হল, বাইরের প্রেক্ষাপটও বদলে গেল। স্বামীর সঙ্গী হল নরেনের বোনঝি আর হালদার বাড়ি থেকে বিতাড়িত যশোদার স্থান হয় হাসপাতালের বেডে। ক্যান্সারে আক্রান্ত যশোদার দৃশ্যপটে ভেসে উঠে এই ক্যান্সার আক্রান্ত সমাজের অবস্থা, যেখানে স্থানে স্থানে পচন ধরে গেছে। এখানে সম্পর্কের কোন মূল্য নেই। তাই যশোদার ভাবনার রেশটিও খুব তাৎপর্যবাহী,

> 'বিশ্ব সংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে
> একলা মরতে হবে। মুখে জলদিতে কেউ থাকে না।'[১]

এই ব্যক্ত স্বরের অন্তরালে লুকিয়ে আছে যে অন্ত:স্বর তা হল সমাজ নিজের স্বার্থে মানুষকে ঈশ্বর করে আবার প্রয়োজন ফুরালে নরকের কীট বানিয়ে পরিত্যাগ করে। সমাজের এই পাশার ছকে কীভাবে নারীর পণ্যায়িত দিকটি উঠে আসে, এবং শেষ পর্বে তার নিজের পরিস্থিতির জন্য যে সূক্ষ্ম শ্লেষ তাই উঠে এসেছে।

'স্তনদায়িনী' যদি মাতৃত্বের করুন গাথা হয়, তবে 'দ্রৌপদী' নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননা এবং অভিনব প্রতিবাদের ছবি। 'ওকে বানিয়ে নিয়ে এস, ডু দি নীড ফুল।' ব্যক্ত এই বাক্যবন্ধ যে স্বর নিক্ষেপ করে আমাদের কানে তাতে এর বাইরের ধ্বনিটুকুই প্রবেশ করেনা শুধুসঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিজাত ভাবনা যেন শব্দ গুলোর উপর বার বার আছড়ে পরতে থাকে। একজন বন্দি অসহায় নারীকে ভোগের প্রয়োজন মাফিক তৈরি করেদিতে বলেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশাসক যাকে আমরা সেনানায়ক হিসেবে দেখি। চিরকাল ধরেই সর্বস্তরে নারী কী এভাবে মনোলোভন ভোগের সামগ্রি হয়ে পরিবেশিত হয়নি এবং উচ্ছিষ্ট হবে পরিত্যক্ত হয়নি? কিন্তু এই সেনানায়কই যখন তার রাতের অন্ধকারের শাসন প্রক্রিয়ার নমুনাকে দিনের আলোয় দ্রৌপদীর নগ্ন শরীরে প্রত্যক্ষ করেন তখন ঢেকে

দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু দ্রৌপদীর প্রতিবাদকে এখানেই অভিনব যাত্রায় পৌঁছে দেন মহাশ্বেতা। যখন সে তার নগ্ন শরীরকে অপরাধকারীর চোখের সামনে নির্বস্ত্রে দাঁড় করায়,নারীত্বই হয়ে উঠে তার সংগ্রামের হাতিয়ার,

> "কাপড় কি হবে কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু.....
>
> হেথা কেও পুরুষ নাইযে লাজ করব। কাপড় মোরে পড়াতে দিব না। আরকি করবি?"[২]

যে সমাজ সভ্যতা ভদ্রতার আবরণ খুলে নগ্ন হয়ে গেছে সে সমাজে পৌরুষের শীর্ষ মোহর অঙ্কিত হয় নারী শরীরের দখলদারিতে, সেই ধর্ষণ নামক সামাজিক ব্যাধি কিভাবে পরিবারের গন্ডি থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিপত্তিশালী পুরুষ–অব্দি সবাইকে একই মানসিক খাচায় বন্দি করে। সেই প্রেক্ষিতে দাড়িয়ে দ্রৌপদীর নগ্নদেহ এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। পুরুষার্থ বলতে যে শৌর্য-বীর্য সাহসকে বোঝায় তা যদি ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করে তবে দ্রৌপদী নিজেকে উলঙ্গ করে সেই সমাজের পচনকেই অনাবৃত করতে চেয়েছে। আবার কিছু গল্পে সামাজিক কুসংস্কারের দিক গুলোকে তুলে ধরা হয়েছে যেমন 'বাঁয়েন' 'ডাইনী' ইত্যাদি। এবং অবধারিতভাবেই এই প্রতিটি সংস্কারকে সমাজ বাঁচিয়ে রেখেছে সমাজের অধস্তন নারীর কাঁধে ভর চাপিয়ে। সব ধরণের মাঙ্গলিক বিধানে নারীকে অপাংক্তেয় করেরেখে তাদের সঙ্গে এই সামাজিক সংস্কার গুলিকে জুড়ে দিয়ে এর সামাজিকীকরণের ওপর জোর দিয়েছেসমাজ যাতে সাধারণের মনে একটা ভীতির ভাব জাগিয়ে নিজস্ব ক্ষমতার আসনটিকে অটল রাখা যায়। এতে সার্বিক স্তরে প্রতাপও অক্ষুণ্ণ থাকে আবার নারী নিস্পেষণের মতো সব চেয়ে জঘন্য অথচ মনোলোভন কাজটিও সহজে সম্পন্ন করতে পারে পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ। মহাশ্বেতার গল্পের বহির্কাঠামোয় এক একটি কাহিনি কোলাজের মতো এঁটে থাকলেও আসলে সমাজ কাঠামো এবং কাঠামো নির্মাতাদের নগ্ন চেহারার উন্মোচনাই তার বাচন প্রক্রিয়ার অন্ত:স্বরের ব্যঞ্জনায় উঠে আসে।

এই ভাবেই ব্যক্ত স্বর এবং অন্ত:স্বরের নিবিড় ব্যঞ্জনায় স্বরান্তরের নতুন ভাষ্য নির্মিত হয়। আর এই স্বরান্তর প্রক্রিয়ায় অব্যক্ত উৎস পাঠ পাঠান্তরের মধ্যদিয়েই উদ্দিষ্ট পাঠে পৌঁছায়।

বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচি মহাশ্বেতার গল্প বিশ্ববিশ্বে প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প নির্বাচন করাসমস্যাকর ব্যাপার। তাছাড়া প্রতিটি সার্থক পাঠকৃতি যখন অস্তিত্বের মতোই অনিবার্য এবং স্বতন্ত্র বিধি নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে তখন যেন প্রতিনিধি শব্দটাই অবান্তর হয়ে পড়ে। মহাশ্বেতার রচিত প্রায় তিনশোরঅধিক ছোটগল্প স্বতন্ত্রতার সঙ্গে বিষয়, বৈচিত্র, কাহিনি, চরিত্র ও আঙ্গিকগত দিক থেকে প্রতিটি গল্পই অনন্য ও প্রতিনিধি স্থানীয়। তবুও মহাশ্বেতার গল্প বিশ্বের কিছু কিছু গল্প স্বতন্ত্র মাত্রা দানের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে ঝড় তুলেছিল। যেমন, 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'শনিচরী', 'বান', বাঁয়েন', 'সাঁঝ সকালের মা', প্রভৃতি গল্পগুলি ছাড়াও আরো বহু গল্প রয়েছে যেগুলি শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয় নিত্য নতুন উপকরণ, নতুন রীতি, ভাষার ঋজুতাএবং প্রতিবাদের নতুন নতুন পদ্ধতিতে স্থান করে নিয়েছে। কেননা সমাজের মানুষ হিসেবে একজন শিল্পী বা সাহিত্যিকের দায়িত্ব কতটা থাকতে পারে তা মহাশ্বেতার ছোটগল্পের মূল বিষয় বস্তুতে ফুঁটে ওঠে। সামাজিক মানুষের জীবনের গভীরে লুকিয়ে থাকা নাভিস্বর থেকে উঠে আসে মহাশ্বেতার গল্প। উঠে আসে সেই Voiceless section এর কথা, যারা দারিদ্র সীমার একেবারে নীচে বসবাস করে তাদের কথা, মানুষের বেঁচেথাকার জন্য যে নিম্নতম প্রয়োজন টুকু থাকা নিতান্তই প্রয়োজন সেই বিষয়ের কথা। জল, মাটি, ধান, নুন, শ্রমের মূল্য এবং সর্বোপরি মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা বার বার উঠে আসে এসব গল্পে। মহাশ্বেতা নিজেও বলেছেন সেই সমাজের কথা, _

> "....আমার লেখার মধ্যে বার বার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ–যাকে আমি বলি the Voiceless section of society. এই অংশ এখনও শুধু নিরক্ষর, স্বল্প স্বাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকেও এরা বড় বিচ্ছিন্ন।

> অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না।....”[৩]

আর এই চেষ্টাতেই ধরা পড়ে যায় ভারতীয় রাজনীতির মূল ভিত্তিটির কেন্দ্রবিন্দু কীভাবে এক স্থান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ছড়িয়ে পরে এবং এই রাজনীতিকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা বা প্রতাপের শেকড় কীভাবে বিস্তার লাভ করে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণির থেকেও যারা আরও বেশি দরিদ্র শুধুমাত্র পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য অনবরত লড়াই করে অভাবের সঙ্গে,তারাই হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার ছোটগল্পের মহানায়ক। কেননা এই শ্রেণির মানুষেরা সমাজের সমস্ত সরকারি বেসরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে আদিযুগ হতেই বঞ্চিত হয়ে এসেছে। মহাশ্বেতা নিজেও একই কথা বলেছেন,

> “..... স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল,জমি,ঋণ, বেঠবেগারি কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।”[৪]

হাতের কলমও যে বড় মাপের অস্ত্র হতে পারে মহাশ্বেতা তা দেখিয়ে দিয়েছেন ছোটগল্পের কোনঠাসা পরিসরের মধ্যদিয়ে। তিনি নিজের মনের মত করে গল্প রচনা করেন না, বরং বলা যায় সমাজে প্রচলিত সমস্যাগুলিকে, সেই বাস্তবতার চিত্র গুলিকে তুলে এনে ছোটগল্পের ডাইমেনসনের রূপ দেন;যার ফলে সাধারন পাঠক বর্গ সমাজের মূল চিত্রটিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান। লেখিকা শুধুমাত্র বাস্তবিক সমস্যা গুলিকে তুলে ধরেই থেমে থাকেন না, পাশাপাশি সমস্যার সমাধানেরও একটা বিকল্প সন্ধানে উপায় দেখিয়ে দেন। সুতীক্ষ্ণ তীব্রতায় ঋজু ওজস্বী কণ্ঠে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। তার প্রতিবাদের ভাষা কখনো কখনো ঝা চকচকে তলোয়ার বা তপ্ত লৌহ শলাকাকেও অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। যা

পুরুষের দীপ্তিমান পৌরুষের ভাষাকেও অনেক সময় পরিহাস করার উপযোগী দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। মহাশ্বেতার নিজস্ব বাচনেও জবানিতেও এইভাবটি ফুটে ওঠে,

> “.....পুরুষের মতো লিখি? না আমি আমিই, আমি আমার মতো লিখি। অন্য কোন ভাবে লিখতে পারিনা আমি। সাহিত্য চর্চা আমার কাছে কিছু নিরন্তর সুখপ্রদ ব্যপার নয়। যন্ত্রনার–প্রশ্নের–আর্তির। আমার সম্পর্কে আমারই আরোপিত এই প্যাটার্নটি চূড়ান্ত ও শেষ থাকুক এ যাত্রা। এ থেকে আমি মুক্তি চাই না।”[৫]

আর এই যাত্রা সেই যে ‘ঝাঁসিরাণী’ থেকে শুরু করেছেন সে যাত্রা আজও অব্যাহত। কেননা তিনি দেখেছেন সমাজের লাগাতার দাঙ্গা–আন্দোলন, চাওয়া-পাওয়ার আনন্দ, না পাওয়ার বেদনা এবং উত্তেজনায় মত্ত ভারতবর্ষকে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সুযোগসন্ধানি, ক্ষমতা-সম্পন্ন মানুষ নিজস্বার্থ চরিতার্থের জন্য সমাজে প্রচলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বেপরোয়া জীবিকা নির্বাহকরে। এক কথায় ধর্মীয় গোড়ামি এবং ক্ষমতাই এদের মূল মন্ত্র। আর এই মূল মন্ত্রকে হাতিয়ার বানিয়েই আধিপত্তবাদের বিস্তার ঘটায়। ফলে শোষিত হয় সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষ। এই শ্রেণির মানুষের কোনো কিছুতেই নিশ্চয়তা নেই। আহার–বস্ত্র–খাদ্য–পানীয় জল থেকে শুরু করে ঘর টুকু পর্যন্ত বসবাসের উপোযোগী হয়ে উঠে না। প্রায় দাসত্ব জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই শ্রেণির মানুষ, অপরদিকে চলতে থাকে নিত্যনতুন শোষণ পদ্ধতি, কৃষক মজুর শ্রমিকদের একমাত্র দেবতা হয়ে দাঁড়ায় মধ্যস্বত্ত্বভোগী জমিদার,জোতদার ও মহাজন শ্রেণির মানুষেরা। অপরদিকে সরকারী দমনমূলক নীতি, প্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং আদিবাসী জনজীবনের মানুষদের মেরে ফেলার খেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই মহাশ্বেতার গল্পের বিষয় বস্তু হিসেবে উঠে আসে।

সমাজের নি:স্বর মানুষ যাদের কণ্ঠরূদ্ধ করে সমাজ, রাষ্ট্র, তাদের কথাই তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা। যদিও তাঁর রচিত গল্পবিশ্বে বিশেষ অর্থে আদিবাসী সমাজকেই চিহ্নিত করা হয়। তথাপি তার সাহিত্যে আদিবাসী–অন্তেবাসী মানুষদের মধ্যে অধিকার বিচ্যুত দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সকল মানুষেরাই উঠে আসে। তাইতো তাঁর রচিত গল্পে কখনো কখনো দেখা যায় বহু নির্যাতিত নিপীড়িত নারী, কখনো দেখা যায় বঞ্চিত পুরুষ, আবার কখনো দেখা যায় অনাহারক্লিষ্ট শিশুকে। তবে নারী পুরুষ শিশু এই সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মহাশ্বেতার গল্পের মূল বিষয় ও সমস্যা হিসেবে উঠে আসে পেটের ক্ষুধা ও সেই ক্ষুধা নিবারণের প্রচন্ড প্রচেষ্টা এবং প্রতিবাদ। এই বিষয় গুলিই মহাশ্বেতার গল্পে বারংবার ঘুরে ফিরে আসে।

যদিও বরণের মাধ্যমে লেখার বিষয়গত আরোহন–অবরোহন বোঝা সমীচিন নয়, তবুও আলোচনার সুবিধার্থে দশক ধরে গল্প গুলির একটা বিভাজন করা যেতে পারে। পঞ্চাশের দশক থেকেই লিখতে শুরু করেন। মহাশ্বেতা, এই সময়ের লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল 'তৃষ্ণা', 'সোনালী মাছ', 'বেড়াল', 'ছেড়াচিঠি', 'রঙ্গওয়ালী', 'আশুডাক্তারের বাড়ি', আবার সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে লিখেছেন, 'আমি ছবি আঁকিনে আঁকে আমার মন'(১৯৫২), 'কালবৈশাখি' (১৯৫২), 'বিস্মরণী' (১৯৫২), 'একটি আষাঢ়ে গল্প' (১৯৫৪), 'গোরু একটি গৃহ পালিত জন্তু' (১৯৫৪), 'শান্তি কুঞ্জ' (১৯৫৪), 'মাঝরাতের ইন্তেজার' (১৯৫৪), 'প্রতিশ্রুতি' (১৯৫৪), 'মিঞা কি মল্লার' (১৯৫৪), 'ইন্দোরের লবঙ্গ লতিকা রায়' (১৯৫৪), 'অনবরত বাগচির হিমালয় যাত্রা' (১৯৫৫), 'অনবরত বাগচি এবং দ্বীপান্তরিতা' (১৯৫৫), 'কারণছিল' (১৯৫৫), 'পূর্বাভাস' (১৯৫৫), 'মালতিরা কোথায় যায়' (১৯৫৫), 'পুতুল দিদি'(১৯৫৫), 'ত্রিভূজ' (১৯৫৫), 'একমাত্র আত্মীয়' (১৯৫৫), 'মদনের বিয়োগ কাহিনী' (১৯৫৬), প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। মহাশ্বেতা দেবী নামে রচিত পঞ্চাশের দশকের গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গল্প গুলি হল,-'মরাচিঠি'(১৯৫১), 'বন্ধু বিচ্ছেদ' (১৯৫৬), 'যশবন্তী'(১৯৫৮), 'পরম আত্মীয়' (১৯৫৭), 'রাস' (১৯৫৭), 'পর্বত'(১৯৫৮), 'প্রভৃতি গল্প গুলি ছাড়াও এই সময়ে রচিত হয়েছে 'তৃষ্ণা', 'সোনালী মাছ', 'দাহ', 'বেড়াল', 'ছেঁড়া চিঠি', 'রঙ্গওয়ালী', 'আশুডাক্তারের বাড়ি', এই সময়ের গল্প গুলিতে প্রেম ভালোবাসা, প্রকৃতি,

ক্ষুধা, অভাব, লড়াই, আন্দোলন এবং সর্বোপরি ইতিহাসের বঞ্চনার দিকগুলিকেই উল্লেখ করেছেন। তৎসঙ্গে ধরা পড়েছে ঊনবিংশ শতকের মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাস্তব রূপ। ইতিহাস এবং সাধারণ মানুষের জীবন ধারা একই সূত্রে গ্রথিত হয় মহাশ্বেতার এই সময়ের গল্পগুলিতে। এই সময়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে উঠে আসে সমাজে ব্যবহৃত গাথা কাহিনী, লোক মুখে প্রচলিত ছরা, গান, প্রবাদ, এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বস্তু ও বিষয় সামগ্রী, একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা হতাশা, স্বপ্ন, স্বপ্ন ভাঙার কান্না,অভাব এবং সেই অভাবের সঙ্গে লড়াই করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তবে তার রচিত এই সময়ের ছোটগল্প গুলি ততটা প্রানবন্ত হয়ে ওঠেনি, পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী সময়ে রচিত গল্পগুলির তুলনায়। তবে একটু একটু করে যেন বারুদ সংগ্রহ করছিলেন পরবর্তী সময়েঅগ্নি প্রজ্জ্বলনের জন্য।

ষাটের দশকে মহাশ্বেতার রচিত ও প্রকাশিত গল্প গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য হল, 'অনসূয়া'(১৯৬০), 'শাস্তি' (১৯৬০), 'নিশি' (১৯৬০), 'চক্রব্যুহ' (১৯৬১), 'ননী গোপালের জমা খরচ' (১৯৬২), 'শকুন' (১৯৬১), 'অহিংস' (১৯৬২), 'কিসে যে কী হয়' (১৯৬২), 'ছায়াবাজি' (১৯৬০), 'জোসনা রাতের ছেলে' (১৯৬২), 'শান্তিসুধা সরনি' (১৯৬৫), 'ঊনপঞ্চাশ নম্বর খুন' (১৯৬৫), 'প্রমান ছিলা না' (১৯৬৫), 'ঘড়ি' (১৯৬৬), 'সমান্তরাল' (১৯৬৬), 'খরচ' (১৯৬৭), 'পায়রা' (১৯৬৮), 'হাতির পা' (১৯৬৮), 'অমলিনা' (১৯৬৮), 'একটি বিকেলের গল্প' (১৯৬০), 'রাজযোটক' (১৯৬২), 'ম্যাডোনা' (১৯৬৭), 'আত্মজা'(১৯৬৮), 'নকল' (১৯৬৮), 'সই' (১৯৬৮), জগন্নাথের রথ' (১৯৬৫), 'যশোমতি' (১৯৬৬), 'বান'(১৯৬৮), 'সন্দেশ'(১৯৬৮), 'অগস্থি সাহেবের কুঠি' (১৯৬০), 'সোনার ময়ূর' (১৯৬৭), প্রভৃতি গল্প গুলিতে মহাশ্বেতার বাস্তবতা সন্ধানের প্রয়াস অব্যাহত। সম্ভবত এই সময়েই রচিত মহাশ্বেতারআরও বেশ কিছু গল্প রয়েছে যার প্রথম প্রকাশকাল অজ্ঞাত। যেমন, 'সতীরানির ঘাট', 'শুধু পটে লেখা', 'জলে ঢেউ দিও না', 'পরম আত্মীয়', 'চিন্তা', প্রভৃতি গল্পগুলো ছাড়াও অজ্ঞাত প্রকাশ কালের আরও বহু গল্প রয়েছে ষাটের দশকের। কিছু কিছু গল্প রয়েছে যা পাঁচের দশকে একেবারে শেষের দিকে রচিত হলেও প্রকাশিত

হয়েছে ষাতের দশকের প্রথমদিকে। সে যাই হোক, এই সময়ের ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা ছোটগল্পের রীতি বা প্যাটার্নকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নতুন এক রীতির আগমন ঘটান বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সময়ের রচনা থেকেই মহাশ্বেতার গল্পে ইতিহাসের অন্বেষণ অন্যতম মাত্রা যোগ করে। প্রচলিত ইতিহাসের বোধকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেন এক নতুন ইতিহাস। যে ইতিহাসে থাকে সময়, সমাজ এবং সমাজ বাস্তবতার প্রখরতা। যথার্থ দলিলীকরণের ক্ষেত্রে লেখিকা এই সময়ের গল্প গুলিকেইহাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। কেননা এই সময়ের গল্প গুলিতে শুধুমাত্র সময়ের বর্ণনাই নয়, রয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও। মহাশ্বেতা নিজেও এই সময়ের গল্পগ্রন্থ 'কি বসন্তে কি শরতে'র গল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন,

> "আমি বিশ্বাস করি, ইতিহাস চেতনা (গল্প লেখকের ক্ষেত্রে) এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা বর্তমান সময়কে বুঝতে সহায়তা করবে। শিল্পের জন্য শিল্প করার ক্ষমতা বা সাধ আমার ছিল না, করিনি। যেহেতু অন্য কিছু কাজের কাজ করতে শিখিনি, তাই পারি না পারি লিখে গেছি অবিচার ও শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ও যথার্থ দলিলীকরণকেই যোগ্যতম মাধ্যম মনে করেছি। দুই একটি গল্পের কি ও কেন পাঠকের কাছে রাখছি। 'চিন্তা' গল্পের ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। 'চম্পা' গল্পের ধারনাটি পেয়েছিলাম ১৯৫৭-৫৮ বিষয়ে পড়তে পড়তে। .....লোকবৃত্ত থেকে সংগৃহীত উপাদানকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি, কেননা তা থেকে বোঝা যায় অতীত বর্তমানের সাধারণ লোক কি চোখে ঘটনাটিকে দেখেছেন। সেই সব পুঁজি করেই 'নটী' ও 'অমৃত সঞ্চয়' লিখি এবং 'চম্পা' সহ কয়েকটি গল্প 'ছায়াবাজির' নায়ক পশ্চিমবঙ্গে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সত্য।"[৬]

শুধু কথায় নয়, মহাশ্বেতার কাজেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। লেখিকার গল্প গুলি পাঠ করলে এই উক্তির স্বরূপ সন্ধানের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ ভাবেই তা ফুঁটে ওঠে। এই দশকের গল্পেই ফুটে ওঠে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের অভাব অনটনের বাস্তব চিত্র। বেকার যুবকের বেকারত্বের জ্বালা কর্মের সন্ধান, শিক্ষার জন্য যথাযথ পরিবেশ এবং অর্থের অভাব, অন্ন বস্ত্রের হাহাকার, বাস্তুহারা সমস্যা, এবং সর্বোপরি নিরুপায় মানুষের আত্মহত্যা পর্যন্ত লেখিকার কলমে ধরা পরেছে। শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণিই নয় নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন কাহিনির যথার্থতাও বর্ণিত হয়েছে ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে। তবে সম্ভবত লেখিকা ষাটের দশকের গল্প গুলিতে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের উত্তাল ও উন্মাদনার চিত্রকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ঐ সময়ের কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যা মহাশ্বেতার লেখায় অধরা থেকে গেছে। উত্তাল ও উন্মাদনার মূল সময়চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ সেরকমভাবে কোথাও যথাযথ বর্ণিত হয়নি। তবে পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের রচনা থেকে বর্তমান মহাশ্বেতার গল্পে সময়ের পূর্বাভাস যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সত্তর ও আশির দশকে মহাশ্বেতা দেবীর সর্বাধিক ছোটগল্প রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই সময়ের গল্পগুলি বাস্তবতা ও সময়ের দলিলীকরনের দিক থেকে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেপাঠক মহলের কাছে। লেখিকার সত্তরের দশকে রচিত গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যগল্প গুলি হল,-'সাঁঝ সকালের মা' (১৯৭০), 'ভীষ্মের পিপাসা' (১৯৭০), 'বিশালাক্ষির ঘর'(১৯৭০), 'বাঁয়েন', (১৯৭৫), 'হারুন সালেমের মাসি' (১৯৭১), 'নেশা' (১৯৭১), 'যমুনাবতীর মা' (১৯৭২), 'আজীর'(১৯৭৪), 'মাদার ইন্ডিয়া' (১৯৭৫), 'এইচ. এফ. ৩৭ রিপোর্টাজ' (১৯৭৭), 'নিহত ও মৃত' (১৯৭৭), 'স্তনদায়িনী'(১৯৭৭), 'অনন্ত খাটুয়া : এইচ. এম.' (১৯৭৯), 'শিশু' (১৯৭৮), 'নুন' (১৯৭৮), 'বিছন' (১৯৭৬), 'ধৌলী' (১৯৭৯), 'রুদালী' (১৯৭৯), 'কান্না' (১৯৭০), 'পরবাসী'(১৯৭১), 'চড়ক' (১৯৭৩), 'অবলা-সবলা'(১৯৭২), 'বিস্ময়' (১৯৭২), 'জল' (১৯৭৪), 'জানোয়ার' (১৯৭৬), 'কমলালয়' (১৯৭৬), 'অপারেশন বাকুলি' (১৯৭৮), 'ঘর' (১৯৭৮), 'ওরা' (১৯৭৯), 'শূন্যস্থান পূর্ণ কর' (১৯৭৯), 'পাপের উৎস সন্ধানে' (১৯৭৯), 'সিন্ধুবালা' (১৯৭১), 'জলসত্র' (১৯৭২),

'পিন্ডদান' (১৯৭৩), 'ভাত' (১৯৭৫), 'উর্বষী ও জনি' (১৯৭৫), 'মাছ' (১৯৭৮), 'নিশাত মাঝির ভূটান যাত্রা'(১৯৭৮), 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ' (১৯৭৯), 'সুকু দুকুর ঊনআশি'(১৯৭৯), 'রথ' (১৯৭৩), 'আষাঢ়ে' (১৯৭৪), 'এক কড়ির সাধ' (১৯৭৬), 'ভারেঙ্গার ভূত' (১৯৭৮), 'শেয়াল কাটার ফুল' (১৯৭৫), 'মলিনা সোমের দিন ও রাত' (১৯৭১), 'ধীবর' (১৯৭২), 'বিগুলাল' (১৯৭৩), 'দৃশ্যপটে আমিই নায়ক' (১৯৭৭), 'ধরমারু' (১৯৭৯), 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' (১৯৭৩), 'দুইবিঘা জমি' (১৯৭৩), প্রভৃতি গল্প গুলি ছাড়াও মহাশ্বেতার আরও বহু গল্প রয়েছে যা সত্তরের দশকে প্রকাশিত। আবার এই দশকেই লেখিকার বহু উল্লেখযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত উপন্যাস ও রয়েছে। তবে এই সময়ে লেখা মহাশ্বেতার উপন্যাস ও গল্পের বিষয় বস্তু হিসেবে উঠে আসে সমাজের বহুবিধ দিক গুলি।

এই সময়ে রচিত ছোটগল্প ও উপন্যাসের মূল বিষয় হিসেবে উঠে আসে নকশাল বাড়ি আন্দোলন, এবং সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণি ও দরিদ্রশ্রেণির জীবন জিজ্ঞাসার ও জীবন চিত্রের বাস্তব রূপগুলি প্রকাশিত হয়। সমাজ সংস্কৃতিতে প্রচলিত দাঙ্গা, আন্দোলন বিদ্রোহগুলি যথাযথভাবে উঠে আসতে থাকে ছোটগল্পের আকারের মধ্যে। বিহার, উড়িশ্যা,পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ তাদের গোটা জীবন পরিধি নিয়েই উঠে আসেন মহাশ্বেতার ছোটগল্পের মধ্যে। জমিদার, জোতদার, মহাজন শ্রেণির শোষণ, নির্যাতন, এবং প্রশানের নির্বিচারে মানুষ মারার খেলা, কৃষকদের সম্পত্তি রক্ষার লড়াই, আদিবাসী সমাজের সাধারন মানুষের মৌলিক অধিকারের আন্দোলনের, বনভূমি রক্ষা, আদিবাসী জন জীবনের অরন্যের অধিকার, এবং সেই অধিকারের জন্যে লড়াই, দরিদ্র সাধারণ মানুষকে হত্যা, শ্রমিকের সংবিধানে উল্লেখিত মুজুরি না পাওয়ার প্রতিবাদ, নারীর প্রতি অবিচারএবং বেঁচে থাকার জন্য অন্ত্যজ শ্রেণির ভূমি-মানুষদের নূন্যতম উপকরণের জন্য লড়াই (জল, নুন, ভাত, বাসস্থান, কাপড়, স্বাধীনতার) প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তব সমাজ থেকে সংগ্রহ করে লেখিকা ছোটগল্পের নঁকসী কাঁথায় প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময়ে রচিত গল্পগুলি যে বাস্তব সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে রচনা করেছেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কেননা

তাঁর গল্পগুলি পাঠ করলে বাস্তবতার চিত্রই ফুঁটে ওঠে। তাছাড়া লেখিকা নিজেও সে কথাই উল্লেখ করেছেন এই সময়ের গল্পগুলি প্রসঙ্গে,

> "…. 'সংরক্ষণ' থেকে 'স্তনদায়িনী' প্রত্যেকটিতে আমি যা ঘটে আসছে, ভয়ঙ্কর একই রকম ভাবে, প্রাচীন দিন থেকে আজ এবং আগামী শতকেও, সেই কথাই লিখেছি। শোষণ নির্যাতন, প্রশাসনের মানুষ মারা খেলা, অরণ্য–অরণ্য প্রাণী–অরণ্য সন্তানদের মুছেফেলা, সংস্কারের দায়িত্ব, নারীর অবস্থান, অতীতে যা ছিল, আজও তাই আছে, প্রতিবাদে জ্বলে ওঠা এ কাহিনিও নতুন কিছু নয়। …. আমার লেখার চরিত্রদের যেহেতু শ্রেণি হিসেবে দেখি সেহেতু মনে করি মেয়েদের বিপন্নতা, নারীমাংসের ব্যবসা এ সবই সত্য, কিন্তু দরিদ্র সীমারেখার নীচে যে জগৎটা বড় হচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে, সেখানে সকলই শোষিত। কখনো শুনি আমি বিপ্লবের প্রবক্তা। আমি কিছুই নই। চুয়াত্তরে পৌঁছে সারসত্য উপলব্ধি করেছি আমি তাই লিখেছি, যা অনন্ত কাল ইতিহাসে ঘটে এসেছে।"[৭]

এই সময়ের গল্পগুলিতে লক্ষ করা যায় অতীতের ঘটনার ব্যবহার তবে অতীতের ঘটনাকে বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। ছোটগল্পের চরিত্র গত দিক থেকেও আর এক স্বতন্ত্র বৈচিত্রময় বিষয়কে লক্ষ করা যায়। কেননা তাঁর গল্পের চরিত্ররা নারী–পুরুষ বিভেদগত দিক থেকেও সম মর্যাদায় ঘটনার আবহে আবর্তিত হয়। যার ফলে মহাশ্বেতা বেশকিছু গল্পের চরিত্রই হয়ে উঠেছে ক্ষয়িষ্ণু সময়ের প্রতিনিধি। আর এই বিষয় হিসেবে কখনো উঠে আসে নারী, কখনো পুরুষ, আবার কখনো বা শিশু। তবে এই ত্রি-স্তর জীবনেরই মূল বিষয় হিসেবে উঠে আসে শোষন ও নির্যাতন, নিপীড়নের দিকগুলি। আর এই শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়নের মূলে রয়েছে সমাজ সংস্কারের বৈষম্যমূলক নীতি। আর এই রাজনীতিই মহাশ্বেতার গল্পে এক অন্যতম বিষয় হিসেবে উঠে আসে। যা পাঠক বর্গকে

ভাবায়, জাগায় এবং সচেতন করেদেয়। সম্পর্ককে ঘিরে বিভিন্ন জীবিকা মহাশ্বেতার গল্পেই প্রথম বিষয় হয়ে আসতে থাকে এই সময়ের গল্পগুলি থেকে। যেমন, মাতৃত্বকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ, নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে জীবিকা নির্বাহ অন্ত:সার শূন্য কান্না হয়ে ওঠে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, প্রভৃতি দিক গুলি মহাশ্বেতার গল্পে স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে আবির্ভূত হয়। তবে এই সব অদ্ভুত জীবিকা নির্বাহের মূলে ছিল ক্ষুধা। যারফলে মহাশ্বেতার বহু গল্প রয়েছে যেখানে রোমান্টিক প্রেমের গল্প হওয়ার যথাযথ উপকরণ থাকা সত্ত্বেও জীবনের কঠোর বাস্তবতা 'ক্ষুধা'র কাছে রোম্যান্টিকতা পরাজিত হয় এবং অনাহার ক্লিষ্ট ক্ষুধা, হাহাকার, অন্নবস্ত্রের সংকটই ছোটগল্পের প্রধান বিষয় বস্তু হিসেবে পরিগনিত হয়।

মহাশ্বেতা দেবী সর্বাধিক গল্প রচনা ও প্রকাশিত করেছেন আশির দশকে। তাঁর এই সময়ের গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গল্প হল, 'টোটকা' (১৯৮০), 'পিতাপুত্র' (১৯৮০), 'এজাহার' (১৯৮০), 'শনিচরী' (১৯৮১), 'রাজা বাদসার রূপকথা' (১৯৮১), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮১), মায়ের মূর্তি' (১৯৮০), 'জাহ্নবী মা' (১৯৮১), 'কানাই বৈরাগীর মা' (১৯৮১), 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮১), ' প্রেতোৎসব' (১৯৮১), 'হুলমাহার মা' (১৯৮২), 'গ্রাম বাংলা' (১৯৮৩), 'সীমান্ত' (১৯৮৩), 'অন্ধকারের সন্ততি' (১৯৮৩), 'রাজা' (১৯৮৩), 'স্বদেশের ধূলি' (১৯৮৩), 'লাইফার' (১৯৮৩), 'তেপান্তরি' (১৯৮৩), 'দৌলতি' (১৯৮৩), 'পালামৌ' (১৯৮৩), 'ভাতুয়া' (১৯৮০), 'তরাস' (১৯৮০), 'ফারকাটি' ৯১৯৮১), গিরিবালা' (১৯৮২), 'ভাত' (১৯৮২), 'কুড়োনির ব্যটা' (১৯৮২), 'জোচ্চোর' (১৯৮২), 'চড়ক' (১৯৮২), 'ভয়' (১৯৮২), 'কানু' (১৯৮২), 'সমাজবাদববুয়া' (১৯৮০), 'সাপ'(১৯৮৩), 'রংনাম্বার' (১৯৮৪), 'অর্জুন' (১৯৮৪), 'গনপতি কোটাল' (১৯৮৪), 'গতিগঙ্গা যুগিদাস নাইয়া' (১৯৮৪), ভূমিদাত্রী' (১৯৮৪), 'ভাষাভাসি' (১৯৮৪), 'গন্ধ' (১৯৮৪), 'নিখোঁজ' (১৯৮৫), 'ছোঁয়াচ' (১৯৮৫), 'উদ্বদের জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৮৫), 'তেতরি কহানি' (১৯৮৫), 'দূরদর্শন' (১৯৮৬), 'ভারতবর্ষ' (১৯৮৬), 'শরীর' (১৯৮৪), 'তারপর'(১৯৮২), 'রঘুয়া দুসাদ' (১৯৮৬), 'রাবণ' (১৯৮৭), 'তোমার তরে আমি' (১৯৮৭), 'হীরামোতি' (১৯৮৭), 'কালিদাসের হেঁয়ালী' (১৯৮৭), 'ঝারোয়ার জঙ্গলে' (১৯৮০), 'বাঘা শিকারী' (১৯৮২), 'চালাক কুমোর বোকা

রাজা' (১৯৮৬), 'ভয়ঙ্কর দূর্গাপূজা' (১৯৮১), 'সেই ছেলেটা' (১৯৮৭), বুদ্ধিমান টিকটিকি' (১৯৮৪), 'ঝোড়ো সাধু' (১৯৮৬), 'রাত ভূতুরে' (১৯৮০), 'ভুলোভূত' (১৯৮৬), 'ছোট্টনানক' (১৯৮৬), চোর' (১৯৮০), 'নেয়না' (১৯৮৫), 'সৌতি এবং গেং' (১৯৮৭), 'বুদ্ধিজীবি' (১৯৮৭), 'আলতা' (১৯৮৭), 'যোদ্ধা' (১৯৮৩), ' সময় এই সময়' (১৯৮৫), 'বানভাসি' (১৯৮৫), 'নৈতিক' (১৯৮৮), 'সস্তা ও দামি' (১৯৮৮), 'চক্ষুদান' (১৯৮৮), 'যাবজ্জীবন' (১৯৮৯), 'খরা' (১৯৮৯), প্রভৃতি গল্পগুলি ছাড়াও এই আশির দশকে লেখা মহাশ্বেতা দেবীর আরো বহুগল্প রয়েছে। তবে এই সময়ের গল্পগুলির মূল বিষয় বস্তু হিসেবে উঠে আসে গ্রাম বাংলার চিত্র, গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন পরিধি এবং প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সামাজিক ওসাংস্কৃতিক সমস্যা। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত কোল–ভিল–মুন্ডা–সাওতাল সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবন চিত্র। তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, বসবাসের সমস্যা, জীবন-যাপন করার আপ্রান চেষ্টা, সরকারী – বেসরকারী দমনপীড়ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সম্পত্তির অধিকার, মজুরির মূল্য, অন্ন–বস্ত্র থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রির লড়াই ব্যর্থতা, হতাশা এসবই পরিপূর্ণ। আবার কোনো কোনো গল্পে দেখা যায় জোচ্চোর, মেয়ের দালালদের হাতে পড়ে অথবা ঐ দালালদের প্রলোভনে পা দিয়ে পতিতা বৃত্তিতে জীবন যাপন, নারীর অধিকার রক্ষার লড়াই, যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরুষের বহু বিবাহের বিরুদ্ধে পরোক্ষ আন্দোলন। নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, উচ্চশ্রেণির পুরুষ দ্বারা নিম্নশ্রেণির নারীকে ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার। এই সব বিষয়ই মহাশ্বেতার গল্পের বিষয় বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে। আবার সমস্ত অন্যায় অত্যাচার, শোষণ নির্যাতন, ধর্ষন, অভাব অনটন, প্রভৃতি বিষয় গুলির প্রতিবাদও বিষয় বস্তুর মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। এই বিষয় গুলি ছাড়াও মহাশ্বেতার গল্পে আরও অনেক বিষয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন,মা ছেলের সম্পর্কের মৌলিক কর্তব্য ও অধিকারের গল্প সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারন দেখিয়ে নারী হত্যা, নারীকে ডাইনী অপবাদ দেওয়া,বাঁয়েন অপবাদ দেওয়া, নারীর পন প্রথাথেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত বিধি নিষেধ আচার ব্যবহার প্রভৃতি দিকগুলি তাঁর গল্পে মূখ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসে।

আবার কখনো দেখা যায় প্রচলিত ইতিহাসের খোলনলচে পাল্টেদিয়ে নব ইতিহাস নির্মাণের প্রচেষ্টা। অর্থাৎযুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিকেরা যে রাজারাজরার ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন মহাশ্বেতা সেই ইতিহাসে প্রচলিত সংজ্ঞাকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। করেছেন ইতিহাসের যথার্থ সংজ্ঞায়ন। তাই এতদিন যে অছ্যত জনেরা ভারতবর্ষের মানচিত্রের বাইরেছিল এ অঞ্চলের অধিবাসী হয়েও সেই অখ্যাত আদিবাসী সম্প্রদায়কে তিনি নতুন পরিচয়ে আখ্যায়িত করেছেন। বিগত শতকের নব্বইয়ের দশক এবং বর্তমান শতক অর্থাৎ একুশ শতকের শূন্যদশক (২০০১-২০০৯), এবং একের দশকের (২০১১) সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া বহু গল্প রয়েছে যেগুলোর প্রথম প্রকাশের প্রকাশ কাল অজ্ঞাত রয়েছে। এই সময়ের গল্পগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য হল,-'চিনু', 'ভরসা', ''নিজের মুখ', 'ঋণ', 'শেষ সাক্ষাৎকার', 'প্রতারক', 'গন্ধ', 'গনপতি কোটাল', 'রংনাম্বার', 'জল', 'জাতুধান', 'দৌলতি', 'গোহুমনি', ' শরীর', 'ঘন্টাবাব', 'তিরের রাজা', 'ভূলোভুত', 'সেই ছেলেটা', 'এককড়ির সাধ', 'লছমনের মা', 'বোকা রাজা', 'চাঁর ভাই', 'ছুরি;, 'গান্ধি ময়দান', 'রুদালী', 'ডাইনী', 'আত্মজা', 'নকল', 'মমতা মাসি', 'দোষ', 'জ্যামিতিক', 'প্রতিবিম্ব', 'স্বাতি চৌধুরি', 'পন্য', 'দাম্পত্য', 'সতী রানির ঘাট', 'শুধুপটে লেখা', 'জলে ঢেউদিও না', 'চিন্তা', প্রভৃতি বহু গল্প রয়েছেযেগুলোর প্রথম প্রকাশের প্রকাশ কাল অজ্ঞাত থেকে গেছে। আবার এমনও হয় যে কিছু কিছু গল্পের পত্রিকার নাম পাওয়া গেছে কিন্তু পত্রিকার ফাইলে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। যেমন,-'পদ্মিনী', গল্পটির ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে।আবার এরকমও হয়েছে যে প্রকাশকাল পাওয়া গেছে কিন্তু প্রত্রিকার নাম বা গ্রন্থের নাম অজ্ঞাত থেকে গেছে। যেমন – 'পরম আত্মীয়' (১৯৫৭) এই গল্পের প্রথম প্রকাশের প্রকাশকাল পাওয়া গেলেও প্রথম প্রকাশের পত্রিকার নাম পাওয়া যায়নি।

তাই মহাশ্বেতার গল্পে জীবনের পরিক্রমাই বড় হয়ে ওঠে। সব সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের লেখায় কেন্দ্রিয় বিষয় অবশ্যই মানব জীবন কিন্তু মহাশ্বেতার দ্রষ্টা চোখ যেভাবে জীবনের পরিক্রমা করে তাতে তাঁর লেখার জাতটাই আলাদা হয়ে যায়। মহাশ্বেতা যখন বলেন,

> "আমার একমাত্র না হোক, অন্যতম আনন্দ এইখানে যে সব সময়ই আমি আমার সঙ্গে একা মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। আমার ছায়াদর্পনে আমাকে প্রশ্ন করে না–যা করতে পারতে তা করনি কেন, অঙ্গীকার রাখনি কেন, কেন সমাজ–মানুষ–দেশ–সময়কে অস্বীকার করেছ। এ এক বিশাল প্রাপ্তি।"[৮]

এই প্রাপ্তিতে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই মহাশ্বেতার গল্প ধীরে ধীরে স্তরবদলে রূপান্তরেরদিকে এগিয়ে চলে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রেষ্ঠগল্প মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, সম্পা- অজয় গুপ্ত, কলকাতা, পৃ-১০০

২. তদেব, পৃ-৭১

৩. তদেব, পৃ-১০

৪. তদেব, পৃ-১০

৫. তদেব, পৃ-৯

৬. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ৩য় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, সম্পা- অজয় গুপ্ত, কলকাতা পৃ-৫২৭/৫২৮

৭. শ্রেষ্ঠগল্প মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, সম্পা- অজয় গুপ্ত, কলকাতা, পৃ-১১

৮. গল্প সরণি ষোড়শ বর্ষ, বার্ষিক সংকলন, ১৪১৮, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, পৃ:-৯